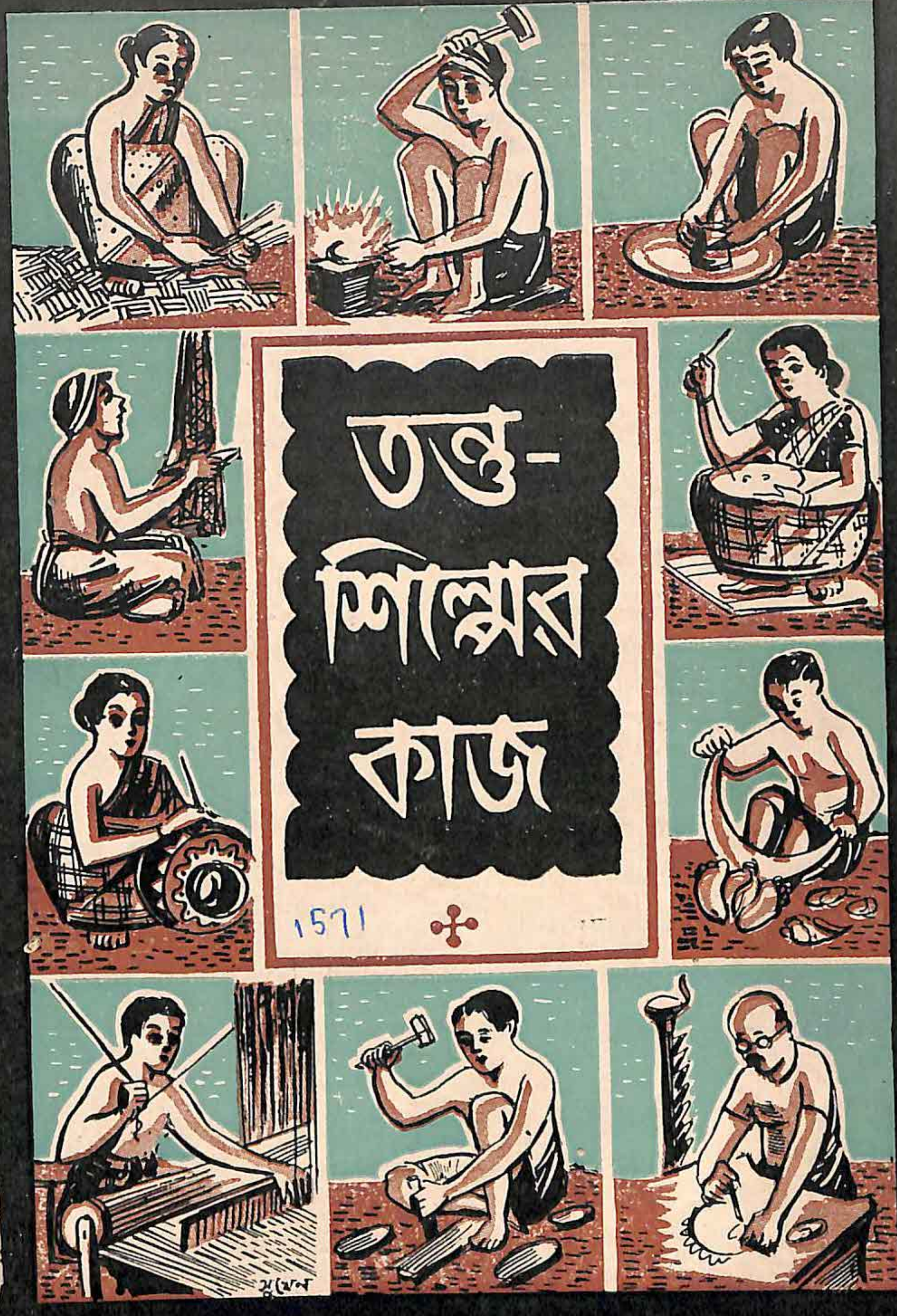
তন্তু-শিল্পের কাজ



Approved as a text-book for Library and Social Education Institutions by the Ministry of Education, Government of India, New Delhi
(Vide List of Books, dated 2nd October, 1955)

তন্তু-শিল্পের কাজ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি. এ.
সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, বি. পি. পালচৌধুরী টেক্‌নিক্যাল স্কুল
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

অশোক পুস্তকালয় পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪নং হ্যারিসন রোড • কলিকাতা-৯

মূল্য এক টাকা মাত্র

৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুস্তকালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীস্বপনকুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬, অন্নপূর্ণা প্রেস হইতে শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শাসনাধীনে বিদেশী যন্ত্র-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশের অনেক শিল্পই ধ্বংস পাইতে বসিয়াছিল। সুখের বিষয়, স্বাধীনতা-লাভের পর আমাদের জাতীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া সেই ধ্বংসোন্মুখ শিল্পের উদ্ধার-সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। সরকারের এই সাধু প্রচেষ্টা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে কারিগরী শিক্ষাও যে অপরিহার্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলার সংস্কৃতি ও বাংলার নিজস্ব রূপ এই শিল্পের মধ্য দিয়াই একদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষায় বয়সের কোন মাপকাঠি নাই। তাই বয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে বয়স্ক-শিক্ষার বই-এর মাধ্যমে। সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজন নাগরিকও উপকৃত হন, তাহা হইলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১৩৬১

গ্রন্থকার

সূচনা

এই সংসারে 'বাঁধন' যে কেবল 'মায়ার'ই আছে, তাহা নয়। পৃথিবীতে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে হইলে পদে পদে বাঁধন দরকার। চালাঘরের ত আষ্টেপৃষ্ঠেই বাঁধন।

এই সব বাঁধন আমরা সাধারণত নারিকেলের দড়ি, পাটের বা শনের দড়ি, বেত, লতা প্রভৃতির দ্বারাই দিয়া থাকি। কাপাস হইতে সূতা হয়। এই সূতার বুনানী দিয়াই আমরা কাপড় তৈয়ারি করি।

'তন্তু'কে চল্‌তি কথায় বলে আঁশ। গাছপালা হইতেই আমরা আঁশ পাই। আঁশ অর্থাৎ সূতা, দড়ি প্রভৃতির দ্বারা আমরা অনেক শিল্পে কাজ করিয়া থাকি।

নারিকেলের দড়ি

নারিকেলের দড়ি আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস। বড় বড় নৌকা বা জাহাজের মোটা দড়ি (কাছি), সাধারণ দড়ি, পাপোশ বা খাটিয়া প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে আমরা নারিকেলের দড়ি ব্যবহার করিয়া থাকি।

ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করা ঃ নারিকেল ফল আমরা তিন রকমে ব্যবহার করি—কাঁচা (বা ডাব), আধপাকা (বা ঝুনা) এবং ঝুনা (বা সম্পূর্ণ পাকা)। আঁশ বাহির করিবার পক্ষে আধ-পাকা নারিকেলই সুবিধাজনক। এই নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া ঐ ছোবড়া জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া ভিজাইয়া লইতে হয়।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, নারিকেল ফল হইতে খোসা ছাড়াইবার সময় আমরা সচরাচর 'দা' ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আঁশ বাহির করিবার সময় ঐ দা দিয়া খোসা ছাড়াইলে ছোবড়া কাটিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, ঐরূপে দা দিয়া ছাড়াইতে সময়ও লাগিবে অনেক।

এইজন্য লোহার তৈয়ারী একপ্রকার চওড়া শাবল, সাঁড়াশী বা ঐরূপ কোন হাতিয়ারের সাহায্যে ছোবড়া ছাড়ানো দরকার। ঐগুলির ফলাটি মাটিতে বেশ শক্ত করিয়া বসাইয়া খোসায় চাড় দিয়া খোসা ছাড়ানোই সুবিধা। এইভাবে ছাড়াইলে একজন লোক দৈনিক দেড় হাজার নারিকেলেরও খোসা ছাড়াইতে পারে।

ছোবড়া ছাড়াইবার পর ঐগুলিকে লোনা স্রোতের জলে ভিজাইতে পারিলেই ভালো হয়। এজন্য অনেক জায়গায় নদী বা খাল হইতে নালার সাহায্যে জল আনিয়া ছোবড়া ভিজানো হইয়া থাকে। খোসাগুলি সাত দিন হইতে সাত মাস, এমন কি, এক বছরও ভিজাইয়া রাখা চলে। ছোবড়াগুলি ভিজানোর আগে মুগুর দিয়া পিষিয়া দিলে ভালো হয়। ছোবড়াগুলি ভিজাইয়া অর্থাৎ পচাইয়া উহা উপরে তুলিয়া লইয়া পিটাইয়া আঁশ বাহির করিতে হয়। আঁশ বাহির করিবার পর উহা শুকাইয়া লওয়া দরকার।

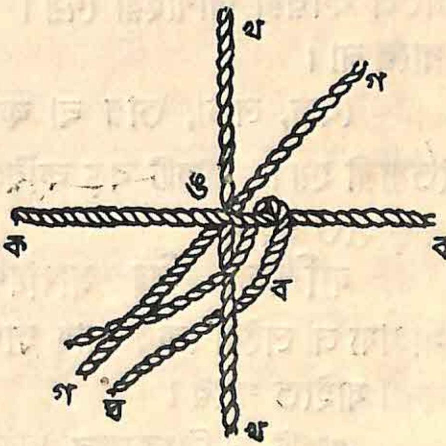
পচাইবার পর ছোবড়ার পিঠের খোলসটা ছাড়ানো হয়। তারপর একখানি চওড়া পাথরের উপর রাখিয়া মুগুর দিয়া ঘা মারিলেই আঁশগুলি আলাদা হইয়া যাইবে। এইবার ঐ আঁশগুলিকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। ধুইবার পর আঁশগুলিকে ছায়া জায়গায় রাখিয়া বাতাসে শুকাইয়া লওয়া দরকার।

এইভাবে শুকাইয়া লইবার পর আবার মুগুর দিয়া আঁশগুলিকে পিটিয়া ঝাড়িয়া লওয়া হয়। এই কাজের জন্য 'কম্বিং মেসিন' (combing machine) বা আঁচড়া যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নারিকেলের দড়ি বা কাতা দড়ি ঃ এই সকল আঁশ হইতে দড়ি পাকাইবার সময় 'গুছি' দিয়া হাতে বা চরকায় সূতা (নারিকেলের আঁশের) কাটিয়া উহা দ্বারা যেভাবে পাটের দড়ি পাকায়, ঐভাবে পাকাইতে হইবে। বড় বড় নৌকার মোটা দড়ি এই কাতার অনেকগুলি তার দিয়া তৈয়ারী হয়। রৌদ্রে বা বৃষ্টিতেও এই নারিকেলের দড়ি বেশ টিকিয়া থাকে।

নারিকেলের দড়ি (coir) দিয়া জাহাজের ঝুলানো (hanging) মই, জিনিস-পত্র লইবার পাত্র, প্যাপোশ প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

নারিকেল দড়ির বাটি ঃ প্রথমে একটা নারিকেলের দড়ি লও (ক)। উহাকে লম্বা করিয়া ফেলিয়া উহার মাঝখানের (ঙ) পাক খুলিয়া ঐ পাকের ভিতর দিয়া আর একটা দাড় (খ) চালাইয়া দাও। অনুরূপভাবে আর একটি দড়ি (গ) লও।



এখন দেখা যাইতেছে, 'ঙ' কেন্দ্র হইতে ছয়টি বাহু বাহির হইয়াছে। এইবার উহার যে-কোনও একটি বাহুতে আর একটি লম্বা

দড়ি পরাইয়া লও। এখন ‘ক’ বাহুকে ভিতরে রাখিয়া ‘ঘ’ দড়ি দুই ভাঁজ করিয়া লওয়া হইল।

তারপর ‘ঘ’-এর বাহু দুইটিকে এমনভাবে উপর-নীচ করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পাকাইয়া যাইতে হইবে যেন, গ, খ, ক বাহুগুলি প্রত্যেকে ঐ ‘ঘ’-এর দুই বাহুর পাকের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে পড়ে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে বুনিতে দেখিবে একটি সুন্দর বাটি বা কাপের মতো তৈয়ারী হইয়াছে।

ইহা দিয়া কত কি কাজ করা যাইতে পারে। কোথাও মাছ, মাংস কিংবা ডিম লইতে হইলে—এইভাবে দড়ি কি লতা দিয়া তৈয়ারী একটি পাত্রে করিয়া সহজেই লওয়া যাইতে পারে।



বিহার অঞ্চলে ছোট ছোট বাছুরের মুখে নারিকেলের দড়ি দিয়া এমনি ধারা একটা বাটির মতন করিয়া লাগাইয়া দেয়। তাহাতে ছোট বাছুর মাটি খাইতে পারে না।

বেত, লতা, তার বা কঞ্চি দিয়া ঠিক এই কৌশলেই ঝুড়ি তৈয়ারী হয়। পাত্রটি বড় করিতে হইলে উহার বাহুগুলির সংখ্যাও বাড়াইতে হইবে।

নারিকেল দড়ির সাধারণ পাপোশ ঃ কোন রকম যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র হাত দিয়া সাধারণ ‘পাপোশ’ তৈয়ারি করা যাইতে পারে।

একটি নারিকেলের দড়ির ‘গুছি’ হইতে একটা লম্বা দড়ি (কাতা) বাছিয়া লইতে হইবে। ঐ দড়িগাছির এক প্রান্তে একটা

ফাঁস গিঁট (গেরো) দিয়া বাঁ-পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া গিঁটটি চাপিয়া ধর। এইবার দড়ির লম্বা ফালিটি টানিয়া ঐ ফাঁসের ভিতর দিয়া শিকলের মতো করিয়া পরাইয়া যাও। পাপোশটির আকার অনুসারে উহাকে যথাসময়ে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হইবে যাহাতে উহা গোলাকার বা ডিমের আকারের হয়।

পাপোশ ঃ নারিকেলের পাপোশ দুই প্রকারে করা হইয়া থাকে —কাতা বা দড়ি দিয়া এবং আঁশ দিয়া।

সাধারণ একখানি বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমে দড়ির পাপোশ তৈয়ারি করা যাইতে পারে। তাঁতে যেভাবে গামছা প্রভৃতি বোনা হয়, ঠিক সেইভাবেই দড়ির ম্যাটিং বা পাপোশ তৈয়ারা হইতে পারে। তবে পার্থক্য এই যে, তাঁতে 'শেড' হয় ঝাঁপের সাহায্যে, আর ফ্রেমে হাতে 'জো' তুলিয়া 'লিজ রডের' সাহায্যে 'শেড' করিতে হয়। তাহা ছাড়া তাঁতে 'শানায়' ঘা মারিয়া থাপি করা হয়, কিন্তু ফ্রেমে কাজ করিবার বেলায় একখানি লোহার ঠেলুনী বিশেষ (বিটার ঃ $\frac{১}{৪} \times \frac{৪}{৫} \times ১$ ফুট) দ্বারা গুঁতা দিয়া থাপি করা হয়। তাঁত যন্ত্রে ইচ্ছামতো লম্বা 'টানা' ছাড়াইয়া বোনা যায়, কিন্তু ফ্রেমের কাজে ফ্রেম অনুযায়ী 'টানা' বসিয়া বুনিতে হয়।

বড় কাঁচি, ছোট কাঁচি, লোহার গোল শিক, ছুরি প্রভৃতি পাপোশ বুনিবার অন্যান্য সরঞ্জাম তাঁত ও ফ্রেমে এক। অবশ্য তাঁতে ফ্রেম অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী কাজ হইলেও ফ্রেমের পাপোশ তাঁতের পাপোশ অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়া থাকে।

পাটগাছের আঁশ হইতে পাট প্রস্তুত হয়। ঢেঁড়স, ধঞ্চে, স্থলপদ্ম প্রভৃতির গাছ হইতেও আঁশ বাহির হইতে পারে, কিন্তু উহা সুবিধা-জনক হয় না বলিয়াই পাট ও শনের ব্যবহার এত বেশী।

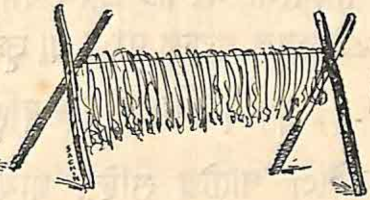
পাট দুই রকম দেখা যায়। এক জাত খুব বড় হয় না, আর এক জাত (আমুনে বা বগি) বেশ বড় ও মোটা হয়। ইহাদের ডালপালা হয় কম। ডালপালা হইলে উহা লাভজনক হয় না এবং উহা হইতে আঁশ বাহির করিবার সময় বেশ বেগ পাইতে হয়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে চাষ দিয়া পাট বুনিতে হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাট কাটিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে (জাগ দিতে) হয়। যে জলে পাট পচানো হয় সে জল নষ্ট হইয়া দুর্গন্ধ হয়। এজন্য পানীয় জলের পুকুর বা যে জলাশয়ের জল ব্যবহার করা হয় এরূপ কোন জলাশয়ে পাট পচাইতে নাই। খানা, ডোবা, গর্ত, বিল, রেলওয়ের খাত প্রভৃতির জলেই পাট পচানো হইয়া থাকে। কালো জলে পাট পচাইবে—ঘোলা জলে পাট পচাইলে পাটের আঁশ কালো হইয়া যাইবে। জলের মধ্যে পাট গাদা দিয়া রাখিলে উহা ভাসিয়া উঠিতে পারে। ভাসিয়া উঠিলে উহার উপর দিকের পাট শুকাইয়া গেলে উহা দ্বারা আর কোন কাজ হইবে না। এইজন্য পাটের গাদার উপর কলাগাছ বা মাটির চাপ্‌ড়া চাপাইয়া উহা যাহাতে ভাসিয়া উঠিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

পাট বেশী পচিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এইজন্য পনের-কুড়ি দিন পরেই ঐ পাট ডাঙায় তুলিয়া উহার আঁশ ছাড়াইয়া লইতে হয়।

পাটগাছের গোড়াগুলি সাম্‌নে রাখিয়া উহা হইতে একটি একটি

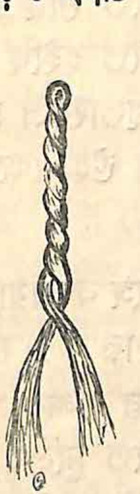
করিয়া পাটগাছ তুলিয়া ঐ গোড়ার আঁশ কিছুটা বাঁ-হাত দিয়া তুলিতে হইবে। তারপর ডান হাত দিয়া ঐ আঁশ-ছাড়ানো সাদা পাটকাঠিটিকে আঙুলের ভিতর দিয়া ধাক্কা দিলেই উহা খুব সহজে সাম্‌নের দিকে চলিয়া যাইবে এবং ইহার আঁশগুলি বাঁ-হাতের মুঠার মধ্যে থাকিয়া যাইবে। কর্মদক্ষ লোকেরা একসঙ্গে দুই-তিনটি পাটগাছও ছাড়াইতে পারে।



পাটের আঁশ ছাড়ানো হইলে ঐ আঁশ আঁটি বাঁধিয়া পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। তারপর বাঁশের লম্বা 'আড়' বাঁধিয়া উহার উপর পাটগুলিকে রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হইবে। পাট শুকাইলে উহা গাঁট বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

পাটের দড়ি ঃ কাঠি বা হাত দিয়া পাটের দড়ি পাকানো যায়।





দড়িগাছটি খুব লম্বা হইলে পূর্ব হইতে পাটের আঁশ পাকাইয়া তিন-চারিটি তার করিয়া কয়েকটি কাঠির সাহায্যে উহা পাকাইয়া লইতে হয়।

দড়িটি ছোট হইলে হাত দিয়াও উহা পাকানো চলে। ডান দিকে পাটগুলি লম্বা করিয়া রাখিয়া উহা হইতে কিছু আঁশ লও। পরে পা ও হাতের সাহায্যে খানিকটা পাকাইয়া লইয়া ঐ পাকানো দিকটা নিজের কোলের দিকে রাখিয়া পাটের সরু মাথার দিকটা

সাম্‌নে রাখিতে হইবে। ঐ দুইটি তার অপর আর একজন মুখোমুখি বসিয়া ফিরাইয়া দিবে। প্রথম ব্যক্তি দুই হাতের তালুর সাহায্যে মধ্যে মধ্যে 'গুছি' জোড়া দিয়া পাকাইয়া যাইবে এবং সাম্‌নের দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার ডান হাত ও বাঁ-হাত দিয়া পাকগুলি ফিরাইয়া দিবে। পাকানো অংশটি প্রথম ব্যক্তিকে পিছন দিকে ঠেলিয়া দিতে হইবে। এইভাবে গরুর দড়ি বা কূয়ার দড়ি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

ঘর বাঁধিবার সরু দড়ি ঃ পাট হইতে সরু দড়ি তৈয়ারি করিতে হইলে পাটের গুছির মাথার সরু দিক নীচের দিকে ঝুলাইয়া গোড়ার দিকটা উপরের দিকে বাঁধিতে হইবে। তারপর একটা লাটাই (বড়) লইয়া এবং একটা কোন উঁচু জায়গার (চৌকি প্রভৃতি) উপর বসিয়া দড়ি কাটিতে হয়। প্রথমে লাটাইয়ে একটা সরু আঁশ পাকাইয়া বাঁধিয়া লইবে। পরে ডান উরুর সঙ্গে লাটাইয়ের কাঠিটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এবং ঐ ঝুলানো আঁশ হইতে 'গুছি' টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া উহাতে যোগ করিয়া পাকাইয়া যাইতে হইবে। টাকুতে সূতা জড়াইবার মতো ঐ লাটাইয়ে পাটের সরু সূতাগুলি জড়াইয়া লইতে হইবে। প্রয়োজনীয় দড়ি পাকানো হইলে উহা খেজুরের ডাঁটা বা বাঁশের চ্যাপ্টা কাঠিতে নামাইয়া দিতে হয়।

এই সরু দড়ির তার তিন-চারিটি একসঙ্গে করিয়া পরে পাকাইয়া লইয়া ঘরের কাজে বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা চলে।

শিকা ঃ পাট হইতে নানারকমের সুন্দর সুন্দর 'শিকা' তৈয়ারী হয়। পাট না পাকাইয়া উহার আঁশ হইতে চুলের বিউনীর মতো বিউনী করিয়া একটি 'বিউনী' আর একটির সহিত জুড়িয়া দিয়া

এইরূপ 'শিকা' তৈয়ারী হয়। শিকা ঝুলাইয়া দুধ বা প্রয়োজনীয় জিনিসের পাত্র, বালিশ প্রভৃতি শূন্যের উপর রাখা যাইতে পারে।

পাট দিয়া শুধু দড়ি-দড়া নয়—মাল-বোঝাই করিবার চট, থলে প্রভৃতি, এমন কি শীতের কাপড় এবং পরিবার কাপড়ও তৈয়ারী হয়। পূর্বে আমাদের দেশে পূজা-পার্বন উপলক্ষে মেয়েরা পাট দিয়া তৈয়ারী একপ্রকার কাপড় পরিতেন ; উহাকে 'পট্টবস্ত্র' বলা হইত।

শন ঃ শন দিয়া পাটের মতোই সব জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে। পাট অপেক্ষা শন বেশী টেকসই। এইজন্য শনের দামও পাট অপেক্ষা বেশী, কিন্তু শন পাটের মতো নরম নয়। ইহার আঁশ পাটের আঁশের মতো লম্বা বা নমনীয় হয় না। এইজন্য শনের সূতা দিয়া কাপড় তৈয়ারীর অসুবিধা এই যে, মাকুর টানে উহার সূতা ছিঁড়িতে আরম্ভ করে। আঁশে বারংবার জোড়া দিয়া কাজ করিতেও বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

আজকাল '*লিনেন*' কাপড়ের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এই কাপড় '*তিসি*' নামক একপ্রকার মৌসুমী গাছের ছাল পচাইয়া যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে তৈয়ারী হয়।

'*লুজো সিল্ক*' চীন দেশের একপ্রকার বড় আদরের কাপড়। ইহা সাধারণ আনারসের পাতার আঁশ হইতে তৈয়ারী হয়। আনারসের পাকা পাতা কিছুকাল জলের মধ্যে রাখিয়া পচাইলে উহা হইতে আঁশের গোছা পাওয়া যায়। ঐগুলি পরিষ্কার করিলে উহা হইতে হাতীর দাঁতের মতো একপ্রকার পীতাভ সাদা খুব সরু ও নরম সূতা পাওয়া যায়। এই সূতা দিয়া বোনা কাপড় বেশ মিহি, নরম ও চক্‌চকে হইয়া থাকে। জাভায় '*বাটিকের*' কাজ-করা এই

কাপড় বেশ দামে বিক্রয় হয় এবং সেগুলি দেখিতেও খুব সুন্দর। প্রায় একশো বছর আগে চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা), বহরমপুর ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে এই আনারসের আঁশ দিয়া কাপড় তৈয়ারী হইত। *ঢেঁড়শের আঁশ* দিয়াও আগে বাগেরহাট অঞ্চলে একপ্রকার কাপড় তৈয়ারী হইত। এই কাপড় বেশ টেকসই ও চক্‌চকে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা আনারসের আঁশ দিয়া তৈয়ারী কাপড় হইতে অনেক অংশে নিরেস হয়।

সূচমুখী ঃ আনারস-জাতীয় আর একপ্রকার গাছ আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গাছ আনারস-জাতীয় হইলেও ইহা আনারস গাছের মতো বড় হয় না। ইহার পাতাতেও কাঁটা নাই, ফলও হয় না। ইহার পাতাগুলির রং গাঢ় সবুজ। ইহার পাতার আগা সূচের মতো সরু। এই গাছের পাতা পচাইয়া উহার আঁশ হইতে যে সূতা পাওয়া যায়, তাহা বেশ শক্ত।

কৃত্রিম সূতা ঃ গত মহাযুদ্ধের ফলে দেশে যখন তূলা, রেশম ও পশম উৎপন্ন কম এবং চাহিদা বেশী হইল, তখন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়িল কৃত্রিম সূতা তৈয়ারীর দিকে। তাহার ফলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ঐ সব সূতার পরিবর্তে ব্যবহার হইতে পারে এমন সূতার আবিষ্কার হইল। এইগুলির মধ্যে 'রেয়ন' (Rayon) ও নানারকম প্লাস্টিক্ সিল্কের ব্যবহার বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে কাঁচ দিয়াও পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী হইয়াছে। কিন্তু এই সব প্লাস্টিক্ আঁশের তৈয়ারী কাপড়ে অসুবিধাও অনেক। এগুলি সূতার কাপড়ের মতো সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করা চলে না এবং কতকগুলি অল্পদিন পরেই ফাটিয়া যায়।

কর্নেল হেট্‌ নামক একজন বিজ্ঞানী রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-জাত সূতাকে রেশম, পশম বা তূলার মতো ব্যবহারোপযোগী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াকে 'হেট্‌-প্রক্রিয়া' বলা হয়। বোম্বাই শহরে তাঁহার একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

তালের ডেগো ঃ তালগাছের ডেগোর গোড়ার দিকটা জলে পচাইয়া উহা হইতেও একপ্রকার আঁশ বাহির করা যায়। এই আঁশ বেশ শক্ত। কিন্তু উহা মোটা বলিয়া সব কাজে ব্যবহৃত হয় না। তালের আঁশ জলে খুব বেশী টিকে বলিয়া মাছ ধরিবার যন্ত্রাদির যদি এই তালের আঁশ দিয়া বুনানী করা যায়, তাহা হইলে উহা ঠিক সরু তারের মতো শক্ত হয় এবং জলে ইহা অনেক দিন টিকিয়া থাকে।

পাট দিয়া প্রস্তুত দ্রব্যাদি ঃ *'পাটের শিকা'*—পাটের শিকা পূর্বে আমাদের দেশে খুব প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন অঞ্চলের পল্লীতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

ঘরের আড়া বা অন্য কোন কিছুর সহিত শিকা ঝুলাইয়া রাখা হয়। গৃহস্থ ঘরে ইহার ব্যবহারে অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। শিকায় কোন জিনিস ঝুলাইয়া রাখিলে উহা পড়িয়া ভাঙিবার সম্ভাবনা কম। শিকায় কোন জিনিস রাখিলে উহাতে সহজে পিঁপড়া লাগিতে পারে না। ইঁদুর, বিড়াল বা কুকুরেও ঐ জিনিস খাইতে পারে না।

শিকা তৈয়ারী ঃ শিকা আল্‌গা পাট দিয়া তৈয়ারী হয়। প্রথমে এক গুছি পাট লইয়া উহাতে গিঁট দিয়া 'জো' তুলিয়া লইতে হয়। 'জো'র গিঁট হইতে চারি, ছয় বা আটটি বাহু রাখিয়া দেওয়া দরকার।

এই 'জো' বা গিঁটটি হইবে শিকার নীচের দিকে; কিন্তু বুনিবার সময় এই নীচের দিকটি উপরের দিকে রাখিয়া এবং কোন কিছুর সহিত উহা আট্কাইয়া উপর হইতে নীচের দিকে চুলের বিউনীর মতো বিউনী দিয়া যাইতে হয়। কিছুদূর বিউনী দিবার পর এক-একটা বাহু হইতে শাখা-বাহু বাহির করিয়া অপর বিউনী শাখার সহিত যোগ করিয়া লওয়া দরকার।



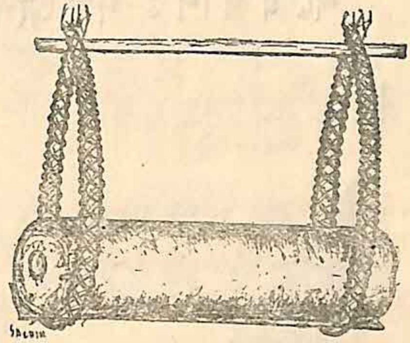
এইভাবে বিউনী দিবার পর শিকাটি যতখানি লম্বা করিতে হইবে, সেইমতো ক্রমে মূল বিউনীগুলিকে একত্র করিয়া এক জায়গায় গিঁট তৈয়ারি করিতে হইবে। শেষ প্রান্তে একটা গোল গিঁট তৈয়ারি করিয়া এবং উহার দশ-বারো আঙুল উপরে (বুনিবার সময়) একটি ফাঁক রাখিতে হয়। শিকা ঝুলাইবার সময় কোন কিছুর সহিত 'শিকা'র ঐ প্রান্ত জড়াইয়া ঐ গোল গিঁটটি ঘুরাইয়া আনিয়া (ঝুলাইবার সময়) নীচের ঐ ফাঁকের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হয়।

শিকায় অনেক কলা-কৌশল দেখানো চলে। প্রয়োজন মনে করিলে শিকায় বিবিধ রং বা বিবিধ রংঙের সূতাও জড়াইয়া দেওয়া চলিতে পারে।

বালিশ রাখিবার তাক : পাটের আঁশ দিয়া বালিশ রাখিবার তাকও তৈয়ারি করা যাইতে পারে। ইহা 'শিকা'র বুনানী হইতে আরও সহজ।

চুলের বিনুনীর মতো ছয়, আট বা দশ গুছি পাটের আঁশ লইয়া বুনিয়া যাইতে হয়। ইহাতে চওড়া ফিতার মতো জিনিস তৈয়ারী

হইবে। বুনানী দিবার সময় গোড়াতে একটি ফাঁক রাখিয়া শেষ প্রান্তেও একটি গোল গিঁট দিয়া রাখিতে হইবে। তারপর আড়া বা ঐরূপ কোন কিছুর সহিত উহা ঘুরাইয়া আনিয়া ঐ ফিতার শেষ প্রান্তটি গোড়ার ফাঁকটির মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হয়। এইভাবে দুইটি ফিতা তৈয়ারি করিয়া একখানি চওড়া তক্তার দুই প্রান্তে উহা আটকাইয়া ঐ তক্তার উপর বালিশ রাখা যাইতে পারে।



খুব লম্বা পাটের ফিতা তৈয়ারি করিলে উহা দ্বারা ঐরূপে দোলনা বা ঝুলন খেলিবার ব্যবস্থাও হইতে পারে।

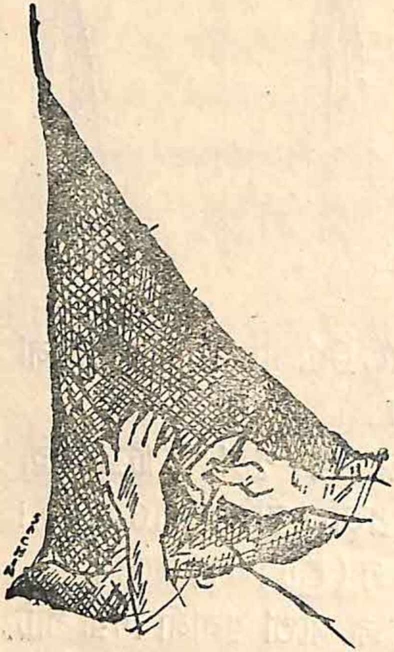
চট, থলে ও মাদুর তৈয়ারী ঃ পাটের সরু সূতা কাটিয়া উহা কলে বুনানী দিয়া উহা দ্বারা চট, থলে প্রভৃতি বুনিয়া লওয়া হয়। যে কলে উহা তৈয়ারী হয়, তাহাকে চটকল (জুট মিল) বলে।

পাটের অতি সরু আঁশ দিয়া কাপড়ের মতো বুনানী দিয়া পাট হইতে আলোয়ানও তৈয়ারী হয়। ঐ আলোয়ান পরে রং করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সাধারণ মাদুর তৈয়ারি করিতে এরূপ সরু পাটের দড়ি ব্যবহৃত হয়। মাদুরের কাঠিগুলির মধ্যে এই দড়ি দিয়া বুনানী দেওয়া হয়। 'মচলন্দী' প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে অবশ্য সূতার ব্যবহারই দেখাযায়। কুশাসন প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার সময়ও কুশগাছগুলির বুনানীর মধ্যে এইরূপ পাটের সরু দড়ি ব্যবহার করা হয়। তাহা ছাড়া,

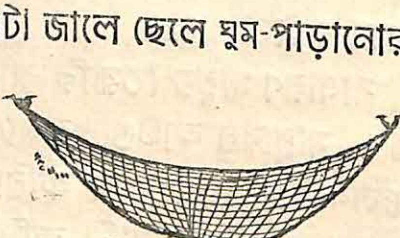
শোলার 'ফুল' তৈয়ারি করিতে, গাছে কলম বাঁধিতে এবং আমাদের প্রতিদিনের বহু কাজেই পাট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শনের আঁশ ঃ পাট অপেক্ষা শন শক্ত কিন্তু পাটের আঁশ শনের আঁশ হইতে নরম বলিয়া পাট-ই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়। পাটের সরু আঁশগুলি দিয়া যেমন বুনানী দেওয়া যায়, শনের আঁশ দিয়া সেরূপ বুনানী দেওয়া যায় না। এইজন্য শন দিয়া একমাত্র দড়ির কাজই করা হয়।



শনের দড়ি দিয়া মোটা জাল তৈয়ারী হইতে পারে। ঐ জাল দিয়া জন্তু-জানোয়ার ধরা, জালের থলে তৈয়ারি করা বা সার্কাসওয়ালাদের তারের খেলার নীচে ধরিবার জালও তৈয়ারী হইতে পারে।

শনের আঁশ দিয়া তৈয়ারী এরূপ মোটা জালে ছেলে ঘুম-পাড়ানোর দোলনাও তৈয়ারি করা যাইতে পারে। দড়িগুলির মুখ এক জায়গায় রাখিয়া 'জো' তুলিয়া লইয়া পরে জাল বুনিবার মতো বুনানী দিয়া যাইতে হয়। এইরূপ জালের মাঝখানটায় চওড়া করিয়া দুই পাশ ক্রমে সরু করিয়া আনিতে হয়। জাল বুনা হইয়া গেলে উহার

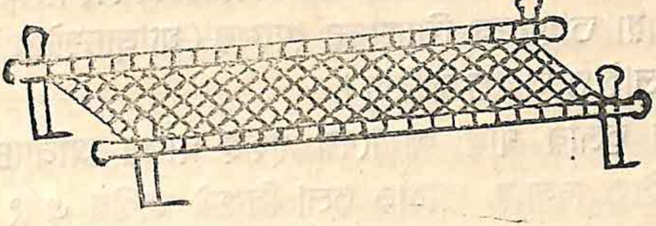


দুই প্রান্ত দুই দিকে কোনও কিছুর সহিত বাঁধিয়া মাঝখানের চওড়া জায়গায় শিশুকে ঘুম পাড়াইয়া রাখা চলে।

নারিকেল দড়ির খাটিয়া : খাটিয়া কাঠের চারিটি পায়ার সহিত চাসা বা খাঁজ কাটিয়া আঁটা থাকে। বাঁশ দিয়াও প্রয়োজনবিশেষে খাটিয়া তৈয়ারী হয়।

খাটিয়ায় মোটা ক্যান্‌ভাসের কাপড় বা ফিতা বাঁধা যায়, কিন্তু উহাতে খরচ বেশী লাগে বলিয়া সাধারণক্ষেত্রে খাটিয়ায় নারিকেলের দড়িই ব্যবহৃত হয়।

তিন বা চারি তার নারিকেলের দড়ি লইয়া খাটিয়ার পাশের কাঠে উহার এক প্রান্ত বাঁধিয়া ঘুরাইয়া অপর পাশের কাঠের সহিত



জড়াইয়া আবার অপর কাঠে জড়াইয়া বুনানী দিতে হইবে। খাটিয়ার দড়ির উপর একটা কিছু পাতিয়া লইয়া উহার উপর শোওয়া চলিতে পারে।

তূলার আঁশ : তূলা তিন রকমের দেখিতে পাওয়া যায়—কাপাসের তূলা, শিমুলের তূলা এবং আকন্দের তূলা। আকন্দের তূলার আঁশ চক্‌চকে হইলেও উহা দিয়া সূতা পাকানো যায় না। শিমুল তূলার আঁশও সূতা তৈয়ারীর পক্ষে অকেজো। শিমুল তূলা

দিয়া বালিশ তৈয়ারী হয়। একটা পুরাতন বালিশের তূলা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, শিমুল তূলার আঁশগুলি কত ছোট।

কাপাসের তূলাই আমাদের সব চাইতে বেশী প্রয়োজনে আসে। আমাদের সূতীর কাপড় ও পোষাক-পরিচ্ছদ এই কাপাসের সূতা দিয়াই তৈয়ারী হয়।

বহুকাল পূর্বেও বাংলা দেশে কাপাস চাষের প্রচলন ছিল। শান্তিপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা) প্রভৃতি স্থানে যে-সব বিখ্যাত শাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার তূলা এই দেশেই উৎপন্ন হইয়াছে।

ইংরেজেরা ব্যবসায় করিতে এই দেশে আসিয়া যখন দেখিল, বস্ত্র-শিল্পে এদেশ অতি উন্নত, তখন তাহারা এই দেশের বস্ত্র-শিল্পের ক্ষতি করিয়া তাহাদের নিজেদের দেশের (ম্যান্‌চেস্‌টার) বিলাতি কাপড় চালাইতে আরম্ভ করিল।

যে-সব তূলার গাছ আমাদের গৃহস্থ ঘরের আনাচে কানাচে আপনা হইতে জন্মায়, তাহার তূলা নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ঐ তূলার আঁশও খুব ছোট। ঐ তূলা দিয়া লেপ, তোষক তৈয়ারী বা চরকায় সূতা কাটা চলিতে পারে।

আমাদের দেশে কাপড়ের কল স্থাপিত হইলে পাঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ, দাক্ষিণাত্য, মাদ্রাজ, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে তূলা আনিয়া কাজ করা হইয়াছে। আমেরিকা, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতেও তূলা আমদানি করা হইয়াছে।

তূলার আঁশ লম্বায় এক ইঞ্চির কম হইলে এবং উহা শক্ত ও পরিষ্কার না হইলে উহা দ্বারা কাপড়ের কলে কোন কাজ করা

যায় না। এইজন্য বাংলায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কাপাস চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গবেষণা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের দেশে হায়দরাবাদ-আমেরিকান্ জাতের তুলাই ভাল ফলন দেয়।

বস্ত্র-শিল্প ঃ পশুরা প্রকৃতি হইতে শীত নিবারণের জন্য লোম পাইয়াছে, কিন্তু মানুষকে নিজের চেষ্টায় শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। আদিম যুগে মানুষ চামড়া ও গাছের বাকল দিয়া শীতাতপ ও লজ্জা নিবারণ করিত। ক্রমে মানুষ গাছ হইতে তন্তু বা আঁশ বাহির করিবার পদ্ধতি শিখিল।

মানুষ প্রথমে চামড়ার ব্যবহার জানিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, উদ্ভিদ হইতে আঁশ বাহির করিবার পূর্বে তাহারা চামড়া হইতে পশুর লোমের ব্যবহার শিখিয়াছিল। ভারতবর্ষ কাপাসের এবং চীন রেশমের জন্মভূমি।

কিন্তু আঁশ হইলেই তাহা হইতে কাপড় তৈয়ারী হইতে পারে না,—উহার কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। আঁশ মজবুত ও লম্বা হইবে, আঁশগুলি যাহাতে পরস্পর আঁটিয়া পাকানো চলে এরূপ হওয়া চাই। আঁশ ওজনে হাল্কা ও নরম হইবে এবং উহার জল শোষণ করিবার ক্ষমতা থাকা দরকার।

এই সকল গুণ থাকা ছাড়াও আঁশগুলি সহজপ্রাপ্য হওয়াও দরকার। যে সকল আঁশ সহজে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাই আমরা দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করি। সাধারণত কাপাস, পশম, শন, রেয়ন ও রেশম—এই পাঁচটি আঁশ কাপড় তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়।

তন্তু বা আঁশ : পশম আমরা কোথায় কোথায় পাই—

পশু হইতে—ভেড়া, ছাগল, চমরী, আলপাকা প্রভৃতি।

পোকার লালা হইতে : তসর, গরদ, এণ্ডি ও মুগা (রেশম বা সিল্ক)।

উদ্ভিদ হইতে : বীজ আঁশ—কাপাস।
ছাল আঁশ—পাট, শন, তিসি।
পাতা আঁশ—কেয়া।
ছোবড়া আঁশ—নারিকেল, তাল।

খনি হইতে : এস্‌বেস্‌টস্ (Asbestos)—পাথর হইতে।

কাপাস : যত রকম তন্তু বা আঁশ আছে তাহার মধ্যে কাপাসের আঁশই সহজে পাওয়া যায় এবং ইহার ব্যবহারেও অনেক সুবিধা। কাপাস দেশভেদে অনেক রকমের আছে। কিন্তু আমাদের দেশে মোটামুটি দুই জাতের কাপাস দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

(১) ক্ষেতী বা বর্ষজীবী ও (২) দীর্ঘজীবী বা দেব কাপাস। ক্ষেতী কাপাস এক বছরের বেশী ভাল ফলনদেয়না, কিন্তু দেব কাপাসের গাছ আট-দশ বছর নিয়মিত তূলা দিয়া থাকে। এজন্য দেব কাপাসের গাছ লাগানোই সুবিধা।



কাপাস তোলা—সুপক্ক অথচ যে কাপাস পোকা বা দাগ লাগা নয়, এমন কাপাস খুব সকালের দিকে তোলা উচিত। এইরূপে তোলা কাপাস কিছুদিন খোলা বাতাসে রাখিয়া দিতে হয়।

বীজ ছাড়ানো ঃ কাপাসের বীজ পূর্বে ছাড়াইয়া রাখিতে নাই ; 'তুনাই' বা পাঁজ করিবার সময় কাপাস হইতে বীজ ছাড়ানো ভাল।

হাত দিয়া বীজ ছাড়াইতে অনেক সময় লাগে এবং উহাতে তূলার আঁশগুলিও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এইজন্য বীজ ছাড়াইবার কল বা তক্তার পাটায় বীজ ছাড়াইয়া লওয়া উচিত। একখানি ছোট তক্তার (৮″×৪″) উপর আধ ইঞ্চি মোটা লোহার শিক দিয়া চাপ দিলে (রুটি বেলিবার মতো) বীজগুলি উপরের দিক দিয়া কাঠের নীচে পড়িবে।

তুনাই ঃ তূলা জমাট বাঁধিয়া থাকিলে উহাকে আস্তে আস্তে ছাড়াইয়া লওয়াকে 'তুনাই' বলে। তুনাই দুই রকমে করা যায়—ছুরি তুনাই এবং ধনুষ তুনাই। পাঁচ ছয় ইঞ্চি লম্বা বাঁশের একটি খণ্ডকে কলম-কাটার মতো করিয়া উহা দ্বারা তুনাই করাকে 'ছুরি তুনাই' বলে। আর বাঁশের ধনুকে শক্ত ছিলা পরাইয়া উহা দ্বারা তুনাই করাকে 'ধনুষ তুনাই' বলে।

পুনাই বা পাঁজ করা ঃ পাঁজপিঁড়ি, হাতা ও পাঁজকাঠির দ্বারা তূলার আঁশগুলিকে বেশ করিয়া পাঁজ করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে 'পুনাই' বা 'পাঁজ করা' বলে।

সূতা ঃ সূতা আমরা মোটামুটি তিন রকমে পাই—কাপাসের সূতা (cotton), রেশম (silk) ও পশম (wool)।

কাপাসের সূতা ঃ কাপাসের তূলা হইতে দুই রকমে সূতা কাটা হয়—(ক) তক্‌লির সাহায্যে ও (খ) চরকার সাহায্যে।

সূতা কাটা ঃ পাঁজ-করা তূলা হইতে তক্‌লি বা চরকার সাহায্যে সূতা তৈয়ারি করা যাইতে পারে।

সূতা কাটিবার জন্য সর্বপ্রথম তক্‌লিই ব্যবহৃত হইত। পরে আবিষ্কৃত হইল বিভিন্ন রকমের চরকা; কিন্তু তক্‌লিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়া এখনও চরকার সহিত তক্‌লির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

একটি গোল এবং ছোট (এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত) পিতলের পুরু চাক্‌তির মধ্যে লোহার সরু শিক (সাইকেলের স্পোকের মতো) বসাইয়া এবং তলার দিকে ঐ শিকের খানিকটা বাড়াইয়া রাখিতে হয়। ঐ বাড়তি অংশের মাথাটা কিছু সরু বা ছুঁচালো করিতে হইবে। তক্‌লির কাঠির (সরু লোহার শিকটির) মাথায় সূতা আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য খাঁজ কাটিয়া লইতে হয়।

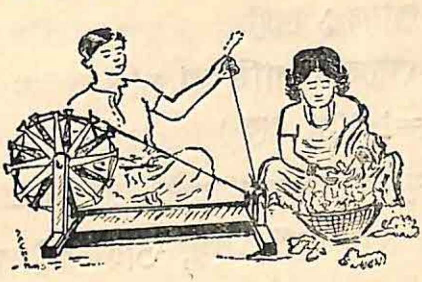
একটা ছোট পাথরের বাটিতে তক্‌লির গোড়াটি রাখিয়া ডান

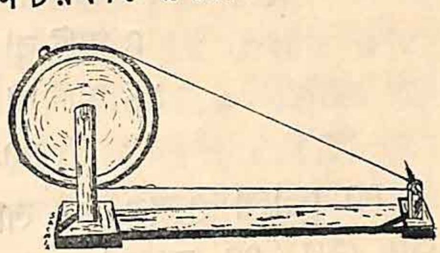


হাতের বুড়া আঙুল ও তর্জনী দ্বারা তক্‌লির কাঠি ঘুরাইতে হয়। বাঁ-হাতে সূতার 'পাঁজ' রাখিয়া সূতা কাটিতে হইবে। তক্‌লিতে সূতা কাটার কতকগুলি সুবিধা আছে, কিন্তু চরকায় ঐগুলি পাওয়া যায় না। খুব সরু সূতা তক্‌লিতেই কাটা সম্ভব। তাহা ছাড়া, পথেঘাটে চলিবার সময়ও তক্‌লির ব্যবহার সহজেই করা যায়।

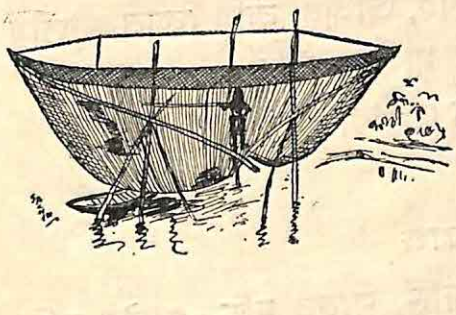
চরকা ঃ চরকায় টেকোর সাহায্যে সূতা কাটা হয়। ডান হাত দিয়া চরকার হাতল ধরিয়া ঘুরাইয়া বাঁ-হাতে পাঁজ ধরিয়া

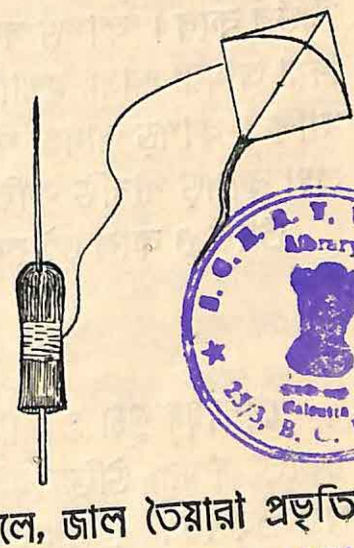
সূতা কাটিতে হয়। বেশী সূতা কাটিতে চরকাই উপযোগী। 'বাক্স চরকা' ও 'পাখী চরকা' এই দুই রকম চরকাই ব্যবহার করা হয়।





সূতা নাটাই ঃ চরকার টেকো হইতে তারপর নাটাইয়ে সূতাগুলি জড়াইতে হইবে। উহাকে '*নাটাই*' করা বলে। দুই 'নাল' সূতা একসঙ্গে পাক দিয়া নাটাই করাকে '*দুবটা*' বলে। সূতা দিয়া আমরা কত কাজ করি। কাপড় সেলাই, খাতা-পত্র, বই ইত্যাদি





সেলাই, জামা তৈয়ারী, ঘুঁড়ি উড়ানো, থলে, জাল তৈয়ারা প্রভৃতি বহুবিধ কাজ আমরা সূতা দিয়া করিয়া থাকি।

সূতার হিসাবঃ ৪ ফুটে ১ তার
৪০ তারে ১ পাটি
৪ পাটি বা ১৬০ তারে ১ লটি
১৬ পাটি বা ৬৪০ তারে ১ লাছি বা গুণ্ডি
(৬৪০ তার = ৮৫৩⅓ গজ)

৪০ তোলা ওজনে যত লাছি, সূতার নম্বরও তত। যেমন—আধ সের (৪০ তোলা) সূতায় যদি ২০ লাছি হয়, তাহা হইলে সূতার নম্বর ২০ হইবে।

তাঁতে কাপড় বোনা ঃ কাপড় বুনিবার প্রধান কথা 'তানা' ও 'পড়েন'। কাপড়ের লম্বালম্বি সূতাগুলিকে 'তানা' এবং আড়াআড়ি সূতাগুলিকে 'পড়েন' বলে। তাঁতে চিরুণীর মতো যে যন্ত্রটি থাকে, তাহাকে 'শানা' বলে। শানার ঘনত্বের উপর কাপড়ের বুনানী নির্ভর করে। কাপড় সরু-মোটা বহু রকমের হইতে পারে। কাপড় দিয়া আমরা জামা, মশারি, তোষক, লেপ প্রভৃতি কত কি করিয়া থাকি। কাপড় আমরা পরি, গায়ে দিই, আবার কোন কোন জাতীয় লম্বা কাপড় পাগড়ি করিয়া অনেকে মাথায়ও বাঁধে।

তাঁতে ও কলে দুই রকমে কাপড় তৈয়ারী হয়।

রেশমের কাজ

রেশমের সূতা ঃ নারিকেলের দড়ি, শনের দড়ি, পাটের দড়ি প্রভৃতি আমরা উদ্ভিদ হইতে পাই, কিন্তু রেশমের সূতা আমরা পাই অন্য প্রকারে। রেশম-কীট নামক একপ্রকার কীট হইতে আমরা এই সূতা পাইয়া থাকি।

কুলগাছ বা তুঁতগাছের ডালে অনেক সময় রেশম-কীটের গুটি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গুটির উপর দিকের মুখটি কাটা। রেশম-পোকা নিজের চারিদিকে এই রেশমী সূতার গুটি তৈয়ারি করে। তারপর ঐ গুটির মুখ কাটিয়া সে বাহির হইয়া পড়ে। ইহাদের সূতা দিয়াই গরদ, তসর, মট্‌কা ও মুগা প্রভৃতির কাপড় তৈয়ারী হয়। আজকাল সকল সভ্য দেশেই এই রেশম-কীট চাষের উন্নতির জন্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই রেশম-কীটগুলি চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। ইহারা আমাদের চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায়। একটু চেষ্টা করিলেই আমরা ইহাদের চিনিতে পারি। আমরা প্রায় সর্বদাই বিভিন্ন প্রকার প্রজাপতি দেখিতে পাই। এই সকল বিভিন্ন রকমের প্রজাপতির ভিতর হইতেই রেশম-কীটকে চিনিয়া লইতে হইবে।

গায়ে ভেল্‌ভেটের মতো নরম লোম ও পাখায় গোল গোল দাগ দেওয়া প্রজাপতি আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই। ইহারা কিন্তু দিনের বেলায় বড় একটা বাহির হয় না। রাত্রিকালে এবং বিশেষ করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রেই ইহারা উড়িয়া বেড়ায়। সন্ধ্যায়, মধ্যরাত্রে বা শেষরাত্রের দিকেই ইহাদের বেশী দেখা যায়। সারাদিন ইহারা পাখা দুইটি ছড়াইয়া দিয়া বা মাথার উপর লম্বভাবে রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে। গাছের পাতার সহিত ইহাদের পাখার এমন মিল হইয়া যায় যে, রেশম-কীট কোথায় আশ্রয় লইয়া আছে, কীটভুক্ প্রাণীরা তাহা বুঝিতেই পারে না।

এই রেশম-কীটের পুরুষগুলির গায়ের রং বাদামী বা ঈষৎ লাল আভাযুক্ত এবং স্ত্রীগুলির গায়ের রং হলদে আভাযুক্ত। মৌমাছির

জীবনের মতো রেশম-কীটের জীবনও খুব বিচিত্র। ইহাদের জীবনকালও মৌমাছির মতো সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য প্রজাপতিরা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া খাইয়া থাকে ; ইহারা কিন্তু সেরূপ পারে না। ফুল দেখিলে ইহারা অনেক সময় সেখানে ছুটিয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা মধু আহরণের জন্য নয়। ইহাদের সৌরভবোধ খুব তীক্ষ্ণ বলিয়া ইহারা ঐরূপ করিয়া থাকে।

এই সব রেশম-কীটের নিকট হইতেই আমরা গরদ, তসর, মট্‌কা, এণ্ডি ও মুগা প্রভৃতির সূতা পাইয়া থাকি। মুর্শিদাবাদ ও কাশীর রেশম-বস্ত্র (সিল্ক) বিখ্যাত। বীরভূমের তসর এবং আসামের এণ্ডি ও মুগা কাপড় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

হিমালয়ের নিম্নভাগের ঢালু জায়গাগুলি এই দেশের তসর-কীটের প্রিয় বাসস্থান। ইহারা গাছের ডালে যখন ইহাদের তসরের গুটিগুলি ঝুলাইয়া রাখে, তখন সেগুলিকে ঐ গাছের ফল বলিয়াই ভুল হয়। তসরের সূতা রেশমের মতো উজ্জ্বল না হইলেও এই সূতা খুব শক্ত হইয়া থাকে।

রেশম-পোকার ডিমগুলি আকারে সাবুদানার মতো ছোট। ডিমগুলি ফুটিলে বাচ্চা কীটগুলির রং পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। শেষ অবস্থায় ইহাদের গায়ে মোমের মতো সাদা একটা গুঁড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে ইহাদের দেহে ছোট ছোট শুঁয়াও জন্মায়।

গাছের ডালে গুটি তৈয়ারি করিবার পর রেশম-কীট ঐ গুটির উপরের মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া আসে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই মুখ-কাটা গুটির মূল্য কম।

গুটিপোকার পুরুষগুলিকে বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া স্ত্রীগুলিকে একটি

টিনের ঢাক্‌নি বা 'চোক' দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। স্ত্রী-পোকা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ চোকের মধ্যে ডিম পাড়া শেষ করে। চারি-পাঁচ দিন পরে ঐ স্ত্রী-পোকাগুলিকে পরীক্ষা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষায় যদি কোন স্ত্রী-পোকার রোগ ধরা পড়ে, তাহা হইলে উহার ডিমগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলা নিয়ম। আট-নয় দিন পরে ডিমগুলিতে একটু লাল্‌চে ভাব দেখা যায়। তারপর উহা হইতে কালো রংয়ের পোকা বাহির হয়।

পোকাগুলি বাহির হইবার পরই 'তুঁত'গাছের পাতা খুব সরু করিয়া কাটিয়া ইহাদের খাইতে দেওয়া হয়। ইহার পর প্রায় চারি-পাঁচ দিন অন্তর ইহারা গায়ের খোলস বদলায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রংয়েরও পরিবর্তন হয়। খোলস বদলাইবার সময় ইহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং সেদিন ইহারা কিছুই খায় না। এইরূপে শেষ অবস্থায় ইহাদের গায়ে 'শুঁয়া' জন্মে ও মোমের মতো একটা সাদা চূর্ণ ইহাদের গায়ে দেখা যায়।

এই শেষ অবস্থায় পৌঁছানোর পাঁচ-সাত দিন পরেই পোকাগুলি রেশম-গুটি তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করে। ঐ গুটি তৈয়ারি করিবার জন্য তাহাদের একপ্রকার জায়গা করিয়া দেওয়া হয়। এই জায়গাকে সাধু ভাষায় 'চন্দ্রকী' এবং চল্‌তি কথায় 'তালিয়া' বলে। এই তালিয়ার দুইটি চক্রাকার বাখারীর ফাঁকের মধ্যে ইহারা গুটি তৈয়ারি করে।

এই গুটিগুলি হইতে বিশেষ বিশেষ উপায়ে সূতা বাহির করা হয়। সূতার তারতম্য অনুসারে উহার ভাল-মন্দ এবং মূল্য ঠিক করা হইয়া থাকে।

রেশমের সূতা কাপাসের সূতার মতো বহু প্রকারে ব্যবহৃত হয়। বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) একটি রেশমের কারখানা আছে।

পশমের কাজ

পশুর লোমকে পশম বলে। পশম দিয়া আমরা শীতবস্ত্র তৈয়ারি করি। কিন্তু সব পশুর লোমেই যে কাজ হয়, তাহা নয়। যে-সব পশুর লোম দিয়া কাজ হয়, তাহার মধ্যে ভেড়া বা মেষই সর্বপ্রধান।

আমাদের দেশে ভেড়ার লোমে কম্বল হয়। এই লোম মোটা ও কর্কশ (course)। এইজন্য ইহাতে কম্বল ছাড়া আর কিছুই হয় না।





নদীয়া জেলার মহেশগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভেড়াওয়ালারা কম্বল তৈয়ারি করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কাঁচি দিয়া ভেড়া ও ভেড়ীর লোম কাটিয়া লইয়া উহা হইতে সূতা তৈয়ারি করিতে হয়। এই সূতা

হাত-তাঁতে বুনিয়া কম্বল তৈয়ারি করে। সাদা ও কালো দুই রকমেরই লোম পাওয়া যায়।

ভারতের উত্তর প্রদেশে ভেড়া হইতে যে পশম পাওয়া যায়, তাহা কতকটা ভাল হইলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল পশম পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার 'মেরিণো' নামক মেষের নিকট হইতে। এইজন্য সম্প্রতি ভারত সরকার সেখান হইতে অনেকগুলি মেষ আনাইয়াছেন। হরিদ্বারের নিকট হৃষীকেশ নামক স্থানে এই মেষগুলির চারণভূমি করা হইয়াছে। এই মেষগুলির সাহায্যে যাহাতে ভারতে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট পশম প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

উল শিল্প ঃ পশমেরই ইংরাজী নাম উল। উল স্বদেশী বিদেশী অনেক রকমেরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নানা রংয়ের এবং সরু-মোটা প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের হয়। বাজারে সচরাচর তিন শ্রেণীর উল ব্যবহৃত হয়—চার তার, তিন তার ও দুই তার। পৃথক পৃথক চারি থেই উলকে একসঙ্গে পাকাইয়া একত্র করাকে 'চার তার' বলে। এইরূপে তিন তার ও দুই তার উল হয়। উলের পাক খুলিলে এই তারগুলি দেখা যায়।

দোকানে 'ফেটি' আকারে উল কিনিতে পাওয়া যায়। ফেটি হইতে উলকে গোলাকার করিয়া সোয়েটার প্রভৃতি বুনিতে হয়। গোলাকার করিবার সময় আল্‌গাভাবে গোল করিতে হয়। শক্ত করিয়া গোল করিলে উলের নরমত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

বুনিবার সময় উলের জোড় দেওয়ার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দুইটি উলের জোড় সুন্দর না হইলে বুনানী খারাপ হইবে

এইজন্য দুইটি উল জোড় দেওয়ার সময় উভয় উলেরই মুখে তিন-চারি আঙুল চিরিয়া উভয় উলের মুখ হইতে অর্ধেক তার ছিঁড়িয়া অল্প পাকে জুড়িয়া লইলে মোটা দেখাইবে না। গিঁট দিয়া উল জোড়া না দেওয়াই উচিত।

উলের কাজ যাহারা করিবে তাহাদের কাঁটা ধরা, ফাঁস ও ঘর তোলা, উল জোড়া দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি আগে ভাল করিয়া শিখিয়া লইতে হয়।

সমাপ্ত